ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
চতুর্দশ বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪২০/নভেম্বর-২০১৩

ঘুষের লেনদেন : ভঙ্গিমা ও পরিভাষা

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার*

ভূমিকা

ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য নিয়ম বহির্ভূতভাবে কোনো কাজ করিয়ে নেবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে যে অবৈধ অর্থ বা অন্য কোনো রকম আনুকূল্য প্রদান করা হয়, তাকে সাধারণভাবে 'ঘুষ' বলা হয়। ঘুষ গ্রহণ ও প্রদানকে গণতান্ত্রিক সমাজে আইন ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যায় ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য সুশাসনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে বিশ্বব্যাপী ঘুষের ব্যবহার ও চর্চাকে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা সত্তরের দশক থেকে দুর্নীতি-বিষয়ে অধিকতর মনোযোগ দিয়ে কাজ শুরু করেন। এ সময় থেকে দুর্নীতির বিভিন্ন শাখায় বর্ধিত আকারে গবেষণার কাজ শুরু হয়।[১] সত্তরের দশকে আমেরিকায় ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির পর থেকে সমাজবিজ্ঞানীরা রাজনৈতিক দুর্নীতিকে তাঁদের আগ্রহের গবেষণা-এলাকা হিসেবে গ্রহণ করেন। এসব দুর্নীতিবিষয়ক গবেষণা কাজে ঘুষের প্রসঙ্গও আলোচিত হয়। কিন্তু তখন থেকেই ঘুষের ওপর পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা কাজ করা হয়নি। তবে পরবর্তীকালে ঘুষের ব্যবহার, পরিধি ও চর্চা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সমাজ গবেষকগণ ঘুষের ওপর পৃথকভাবে কাজ শুরু করেন। বর্তমান বিশ্বে গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে সুশাসনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় পাশ্চাত্যে ঘুষের ওপর পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কাজ হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে।[২] এসব গবেষণা কাজে ঘুষের ক্ষতি, কারণ, প্রতিকারের জন্য পরামর্শ এবং ঘুষ গ্রহণের ভঙ্গিমার ওপর যতটা আলোকপাত করা হয়েছে, ঘুষের প্রায়োগিক চর্চা, লেনদেনের ভঙ্গিমা ও পরিভাষার ওপর ততটা আলোকপাত করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে যেসব সমাজবিজ্ঞানী কাজ করেছেন তাদের একটি সীমাবদ্ধতা হলো, তাদের প্রকাশিত কাজগুলো রাজনীতিক ও প্রশাসনিক এলাকার ঘুষচর্চার বিষয়গুলো উপস্থাপন করলেও সামাজিক ঘুষের ওপর অত্যন্ত অপ্রতুল আলোকপাত করেছে। ফলত এ বিষয়টির ওপর এ নিবন্ধে আলোকপাত করা হবে। সেইসঙ্গে এ নিবন্ধে ঘুষের চর্চা, লেনদেনের ভঙ্গিমা ও পরিভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনাও করা হবে। তবে এ আলোচনা করতে গিয়ে ঘুষের পটভূমি, ঘুষ বৃদ্ধির কারণ, ঘুষ নিয়ন্ত্রণের উপায় প্রভৃতি বিষয়েও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। এ নিবন্ধ রচনায় মূলত নিজস্ব পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা এবং প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

---

* অধ্যাপক, রাজনীতি বিজ্ঞান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এবং অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা।

পটভূমি

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানবসমাজে ভালর সঙ্গে মন্দ, নীতির সঙ্গে দুর্নীতি এবং নিয়মের সঙ্গে অনিয়মের উপস্থিতি বিরাজমান ছিল। দুর্নীতির চর্চা ও সক্রিয়তা মানবসমাজে সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই বিদ্যমান ছিল। তবে আদিম সমাজে বা মধ্যযুগে দুর্নীতি এবং ঘুষের মাত্রা, পরিধি ও চর্চা বর্তমানকালের মতো ছিল না। তখন ঘুষ সমাজে ভিন্ন আকারে সক্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে একদিকে জনসংখ্যা ও অন্যদিকে নাগরিকদের সেবাপ্রদানের লক্ষ্যে রাষ্ট্র ও সরকারের কাজের পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এসব কাজ সুসম্পন্ন করতে সরকারের কর্মচারীদের সংখ্যাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হয়। ফলে নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব এবং ক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে হয়। এ ক্ষমতা ব্যবহারের সঙ্গে স্বীয় স্বার্থে অনেক কর্মকর্তা এর অপব্যবহারও শুরু করেন। এভাবে সরকারি প্রশাসনে ঘুষের ব্যবহার শুরু হয় এবং তা ক্রমান্বয়ে সমাজের অন্যান্য এলাকায় সংক্রামিত হয়। তবে প্রথম দিকে দুর্নীতি এবং ঘুষের ব্যবহার সীমিতপর্যায়ে থাকায় একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে এর তেমন প্রাদুর্ভাব হয়নি। কিন্তু বিগত তিনদশক থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্নীতি ও ঘুষের ব্যবহার এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, অনেক উন্নয়নশীল দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা এখন এটিকে সমাজের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেন।

অনেক স্বল্পোন্নত দেশে দুর্নীতি এবং এর অন্যতম মাধ্যম ঘুষকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, উন্নত দেশগুলোতে ঘুষের উপস্থিতি ও চর্চা মোটেই নেই। সাম্প্রতিককালে উন্নত দেশগুলোতেও ঘুষের চর্চা সুশাসনের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তবে উন্নত দেশগুলোতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মতো ঘুষের উপস্থিতি ও চর্চা সর্বত্র মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েনি; যেভাবে আফ্রিকার এবং দক্ষিণ এশিয়ার কিছু দেশে ঘুষ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার নিত্য সঙ্গীর মতো রাজনীতি, প্রশাসন ও সমাজের সকল শিরা-উপশিরায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব দেশে অফিস-আদালত, প্রশাসন, বিচারালয় থেকে শুরু করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সর্বত্রই ঘুষের চর্চা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের একজন সংসদ সদস্য জাতীয় সংসদে এ মর্মে অভিযোগ করেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক লক্ষ টাকা অনুদান নিতে হলে শিক্ষাভবনে দশ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়।[৩]

আরেকজন বাংলাদেশী অ্যাকাডেমিশিয়ান দেখিয়েছেন, বাংলাদেশে ভয়ানক অপরাধ করেও তদন্তকারী কর্মকর্তা ও পুলিশকে ঘুষ দিয়ে অপরাধীরা কীভাবে স্বচ্ছন্দ্যে সমাজে চলাফেরা করে।[৪] বস্তুত এসব দেশে ঘুষ আর শুধু কাস্টমস, পুলিশ, ফরেস্ট, ট্যাক্স প্রভৃতি ঘুষ চর্চার জন্য এযাবৎ বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে পরিচিতি পাওয়া

বিভাগগুলোর মধ্যে সীমিত নেই, পরিবর্তে এই সামাজিক ব্যাধিটি এখন যুগপৎ সমাজে তথা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি অফিস-আদালতে, ধর্মীয় এবং এমনকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া এসব দেশে রাজনীতিতেও ঘুষের উপস্থিতি ও চর্চা লক্ষ করা যায়। রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নিয়োগ, দলীয় পদ-পদবি পেতে ঘুষের আশ্রয় নেবার অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচনকালে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থিগণ গরিব ভোটারদের সমর্থন ক্রয়ে বিভিন্ন কৌশলে তাদেরকে ঘুষ দিয়ে থাকেন। দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর গ্রামাঞ্চলে নির্বাচনের সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাদের সমর্থক নেতা-কর্মীদেরকে ভোটারদেরকে ফ্রি চা-পান-বিড়ি-সিগারেট থেকে শুরু করে শাড়ি, লুঙ্গি, জামা, চাদর এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে নগদ অর্থ ঘুষ হিসেবে প্রদান করে তাদের ভোট ক্রয়ে সচেষ্ট থাকতে দেখা যায়।

একজন বাংলাদেশী নির্বাচন গবেষক তাঁর প্রকাশিত একটি গবেষণা কর্মে ১৯৮০-র দশকের একটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার চরকুলিয়া ইউনিয়নের একজন চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর কেবলমাত্র নির্বানের দিন ভোটারদের সমর্থন এবং নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আনুকূল্য পেতে তাদেরকে ঘুষ প্রদানের লক্ষ্যে ভোটের আগের দিন ১,৬০০ প্যাকেট বিড়ি, ৫০ প্যাকেট স্টার এবং ২৫ প্যাকেট ক্যাপস্টেন সিগারেট, ৯,৬০০ পাতা পান, ৩,৪৬৫টি সুপারি, দুই সের তামাক, ১৬ পাউন্ড চা পাতা এবং ১০ কেজি চিনি ক্রয় করার তথ্য উপস্থাপন করেন।[৫]

ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা সুশাসনের জন্য অন্যতম প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় একে বিশ্বব্যাপী একটি বড় রকমের সামাজিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। এ কারণে এখন বিভিন্ন দেশে ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নতুন আইন ও বিভিন্ন প্রকার প্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্বজনীন সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার কারণেই এখন দেশে দেশে সূচকের মাধ্যমে দুর্নীতি পরিমাপের মতো একই ভঙ্গিমায় ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা পরিমাপের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে ঘুষের সূচক (ব্রাইবারি ইনডেক্স) প্রকাশ করা হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে সরকার এই সূচক দেখে ঘুষচর্চার ক্ষেত্রে নিজ দেশের অবস্থান অনুধাবন করে। এবং এ ক্ষেত্রে নিজ দেশের অবস্থান খারাপ অর্থাৎ নেতিবাচক হলে নতুন নতুন আইন বা প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বন করে ঘুষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হচ্ছে। এ উপমহাদেশে ষাট বা সত্তরের দশকেও ঘুষের চর্চা সীমিত আকারে কয়েকটি সরকারি বিভাগে সীমিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী দশকগুলোতে ঘুষের ব্যবহার ক্রমান্বয়ে সকল সরকারি বিভাগে ছড়িয়ে পড়ে এবং সম্প্রতি সমাজের সকলস্তরে এ সামাজিক ব্যাধির সংক্রমণ ঘটেছে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সরকারি আমলা, রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে সমাজের সকলস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণ ঘুষের চর্চায় জড়িত হয়ে

পড়েন। বর্তমানে এ দেশে ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা এতই ব্যাপকতা পেয়েছে যে অনেকক্ষেত্রে স্কুলে ছাত্র ভর্তি করাতে গেলে, বা একটি রেলওয়ের টিকেট কিনতে গেলেও ঘুষের আশ্রয় নিতে হচ্ছে।

ঘুষ বৃদ্ধির কারণ

সঙ্গত কারণে এখন প্রশ্ন ওঠে– বিশ্বব্যাপী প্রশাসন, রাজনীতি ও সমাজের সর্বস্তরে ঘুষের ব্যাপক বৃদ্ধির কারণ কী? উন্নত বিশ্বের চেয়ে উন্নয়নশীল ও স্বল্প-উন্নত দেশগুলোতে ঘুষের ব্যবহার ও চর্চার মাত্রাবৃদ্ধি লক্ষ করে অনেকে দারিদ্রকেই ঘুষের চর্চা বৃদ্ধির কারণ হিসেবে দেখাতে চান। এদের বক্তব্য অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোর নাগরিক সম্প্রদায়, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকদের অর্থ-বিত্ত তুলনামূলকভাবে কম হওয়ার কারণে তারা তাদের বিত্ত-বৈভব বৃদ্ধির জন্য ঘুষের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরা বলতে চান, দরিদ্র ছোট কর্মকর্তা ও কেরানিরা তাদের উপার্জনের দ্বারা সংসার চালাতে পারেন না বলেই তারা অবৈধ উপার্জনের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং ঘুষের মাধ্যমে তারা বাড়তি উপার্জন করতে চান। এ বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করা যায় না। কারণ, দারিদ্রই যদি ঘুষের কারণ হতো, তাহলে উন্নত দেশগুলোতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা থাকত না। কারণ, ওই সব দেশে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের উপার্জনের অর্থ দিয়ে স্বচ্ছন্দ্যে তাদের জীবন নির্বাহ করতে পারেন। কিন্তু ঘুষের সূচকে বিভিন্ন দেশের অবস্থান পরীক্ষা করে দেখা যায়, অনেক উন্নত দেশে ঘুষচর্চার মাত্রা অনেক উন্নয়নশীল দেশের চেয়েও অনেক বেশি। তবে কেবল উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে ওইসব দেশে ঘুষের কারণ হিসেবে দারিদ্রকে গণ্য করা যায়, যেসব দেশে বাজারদরের সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের এমনভাবে বেতন নির্ধারণ করা হয়, যে বেতন তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য অপ্রতুল। এমন দেশের উদাহরণ হিসেবে আমরা অবশ্যই প্রথমে বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করতে পারি। এখানে রাজধানী ঢাকায় বসবাসকারী একজন সরকারি অফিসের কেরানি যে বেতন পায় তা দিয়ে তার সংসার চালানো সম্ভব হয় না। ফলে বেঁচে থাকার জন্য তাকে ঘুষের মাধ্যমে অবৈধ উপার্জনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়। ফলে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও এখানে জান বাঁচাবার জন্য এবং পরিবার-পরিজন নিয়ে সমাজে টিকে থাকার জন্য তাকে ঘুষের মাধ্যমে উপার্জন বাড়াতে হয়। কিন্তু এ দেশে যারা উচ্চ বেতন পান, যারা তাদের উপার্জন দিয়ে সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন, তারা কি ঘুষ থেকে দূরে থাকেন? কাজেই বলা চলে, দারিদ্রই যদি ঘুষ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হতো তাহলে তো তাদের ঘুষ খাওয়ার কথাই নয়। লক্ষণীয়, দারিদ্রের কষাঘাতে জীবন বাঁচাবার জন্য যারা ঘুষ গ্রহণ করেন তাদের ঘুষের পরিমাণ কম। কিন্তু বড় বড় রাজনীতিবিদ, আমলা, ব্যবসায়ীরা সাধারণত যেসব ঘুষের কাজে জড়িত হন সেগুলো অনেক বড়

অঙ্কের হয়ে থাকে। এরা জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করার জন্য ঘুষচর্চায় জড়িত হন না। এরা অসম সামাজিক প্রতিযোগিতায় শামিল হয়ে নিজেদের বিত্ত-বৈভব বৃদ্ধির জন্য অবৈধ উপার্জন করে থাকেন। এরা এ অবৈধ উপার্জন পুনঃ বিনিয়োগ করে আরও সম্পদ বাড়িয়ে তোলেন। তাই দারিদ্র ঘুষের প্রধান কারণ নয়। বরং মানুষের অসম সামাজিক প্রতিযোগিতায় জড়িত হওয়া এবং রাতারাতি অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার বাসনাও তাকে ঘুষের মাধ্যমে অবৈধ উপার্জনের দিকে আকৃষ্ট করে। তবে এ কথা সত্য যে, দারিদ্র দূর করত পারলে অনেক ছোট ছোট ঘুষ চর্চাকারী চাইলে ঘুষমুক্ত থাকতে পারতেন এবং পারেন।

বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশে ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে সাধারণ মানুষ ঘুষকে খুব একটা অন্যায় মনে না করে উল্টো একে জীবনের স্বাভাবিক নিয়মাচার ভাবেন। চলমান সামাজিক সংস্কৃতি ঘুষকে সমাজে আরও গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে যেন এক প্রকার অঘোষিত সহায়তা দিচ্ছে। এহেন সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণত কার, কী আছে, অর্থাৎ কার কত সম্পদ আছে সে পরিমাপকে তাকে সামাজিক মর্যাদা প্রদান করা হচ্ছে। ব্যক্তির অর্থবিত্ত ও সম্পদের রং বিচার করে তাকে মর্যাদা প্রদান করা হচ্ছে না। এর ফলে অবৈধ সম্পদ ও কালো টাকার মালিকগণ জনগণকে সামাজিক ঘুষ দিয়ে সমাজে মর্যাদা ক্রয় করতে পারছেন। বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে বললে বুঝতে সহজ হতে পারে। যেমন, একজন কালো টাকার মালিক যদি সমাজে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল নির্মাণ করে দেন, অথবা কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে মোটা অঙ্কের অর্থ সাহায্য করেন, তাহলে সবাই তার প্রশংসা করেন। সমাজে তার সম্মান ও মর্যাদা হঠাৎ বেড়ে যায়। কিন্তু তিনি যে অর্থব্যয় করে হাসপাতাল নির্মাণ করলেন, বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যে অর্থ সহায়তা দিলেন, সে অর্থের রং পরখ করে কেউ তাকে প্রশংসা বা নিন্দা করেন না। ফলে কালো টাকার মালিকগণ সেবকের মুখোশ পরে গণসেবার নামে নাগরিক সম্প্রদায়কে সামাজিক ঘুষ দিয়ে সহজেই সামাজিক মর্যাদা ক্রয় করতে সক্ষম হন। এ কালচার সবাইকে কালো টাকা উপার্জনে উৎসাহ প্রদান করার মধ্য দিয়ে ঘুষের চর্চা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক ভূমিকা রাখে।

ঘুষ নিয়ন্ত্রণের উপায়

ঘুষের চর্চা নিয়ন্ত্রণ করতে অধিকাংশ সমাজবিজ্ঞানী ঘুষবিরোধী আইন তৈরি ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং ঘুষখোরদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তবে শুধু আইন করে এবং সে আইনের বাস্তবায়ন করে বা শাস্তি প্রয়োগ করে ঘুষের ব্যবহার কমানো সম্ভব নয়। কেননা ছোট ছোট পদে কর্মরত ছোট কর্মকর্তাগণ, যারা জীবন বাঁচাতে ঘুষ গ্রহণ করেন, তাদেরকে আইন করে বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে ঘুষ গ্রহণ করা থেকে ফেরানো যায় না। তার অর্থ এ নয় যে, ঘুষের বিরুদ্ধে আইন বা

শাস্তির দরকার নেই। অবশ্যই ঘুষবিরোধী আইন ও ঘুষ গ্রহণের জন্য শাস্তি প্রদানের প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এহেন ব্যবস্থা ঘুষখোরদের ওপর কিছুটা হলেও মানসিক চাপ সৃষ্টি করে। তবে সবচেয়ে ভালো হবে, এব্যাপারে দীর্ঘমেয়াদি পরিকলপনা গ্রহণ করে যদি দেশবাসীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে ঘুষবিরোধী ও ঘুষ-ঘৃণাকারী মানসিকতা তৈরি করা যায়। এ কাজটি করতে পারলে একদিকে যেমন সহজে কেউ ঘুষের লেনদেনে জড়িত হতে চাইবে না, অন্যদিকে তেমনি ঘুষখোরেরাও আর অন্যদের কাছে ঘৃণার পাত্র হিসেবে পরিচিত বা বিবেচিত হয়ে অনেকটা সামাজিক বয়কটের মতো পরিস্থিতিতে পড়বে। এর ফলে ঘুষখোরগণ সমাজে বুক ফুলিয়ে চলতে না পেরে ম্রিয়মাণভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়বে। এব্যাপারে শিক্ষা, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও ধর্মকে পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করে ঘুষ নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবা যায়। এছাড়া রাজনীতি ও প্রশাসনে অবৈধ পন্থা অবলম্বনকারী ও ঘুষ গ্রহণকারীদের চিহ্নিত করে তাদেরকে কোণঠাসা করার উদ্যোগ নিয়ে ঘুষচর্চা কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সৎ কর্মকর্তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েও ঘুষচর্চা রোধে উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

শিক্ষাব্যবস্থার পাঠ্যক্রমে অন্য বড় বড় জাতীয় সমস্যাগুলোর ওপর যেখানে প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্রছাত্রীদেরকে ধারণা দেওয়া হচ্ছে, সেখানে ঘুষকে জাতীয় সমস্যা মনে করে যদি এসমস্যার সমাধানকল্পেও স্কুল পাঠ্যক্রমে প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করে কোমলমতি কিশোর বয়সের ছাত্রছাত্রীদেরকে পাঠদান করানো যায়, তাহলে দীর্ঘমেয়াদে তাদের মধ্যে ঘুষবিরোধী মানসিকতা তৈরি হতে পারে। ঘুষ যে চরম অন্যায় এবং একাজে জড়িত হওয়া যে গর্হিত অপরাধ, সে বিষয়টি কীভাবে শিশুদের মনে বদ্ধমূলভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়– সে ব্যাপারে শিশু মনস্তাত্ত্বিক ও শিশু গবেষকদের গবেষণার সুযোগ রয়েছে। সরকার আগ্রহী হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ শুরু করতে পারে।[৬]

শিক্ষার মতো ধর্মের সুপরিকল্পিত ব্যবহার নাগরিকদের মধ্যে ঘুষবিরোধী মানসিকতা তৈরিতে শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে কাজ করতে পারে। যেহেতু বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকগণ ধর্মবিশ্বাসী এবং তারা ধর্মের প্রতি দুর্বল ও সহানুভূতিশীল, সে কারণে এ ক্ষেত্রে ধর্মের ব্যবহার এসব দেশে ঘুষের মাত্রা হ্রাসে সুফলদায়ক হতে পারে। মনে রাখতে হবে, এ ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ ধর্মের কথা বলা হচ্ছে না; কারণ সকল ধর্মই অন্যায়বিরোধী। অবৈধ উপার্জনকে কোনো ধর্মই সমর্থন করে না। কাজেই মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা বা অন্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা পরিচালকগণ যদি ধর্মীয় বিধানানুযায়ী ঘুষখোরদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে ধর্মবিশ্বাসীদের অব্যাহতভাবে বারংবার ধারণা দিতে থাকেন তাহলে ধর্মবিশ্বাসী অনেকেই এ অন্যায় কাজ থেকে ফিরে আসবেন। যতই ধর্ম-কর্ম

করা হোক না কেন, ঘুষের মাধ্যমে অবৈধ উপার্জন করলে যে সেই প্রার্থনা বা ইবাদত কোনো কাজে আসবে না– এ বিষয়টি যদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত পরিচালকগণ ধর্মবিশ্বাসীদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারেন তাহলে ঘুষের ব্যবহার ও চর্চা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে পারে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরা ঘুষ নিয়ন্ত্রণে পরামর্শ প্রদানের সময় ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার এহেন পরামর্শ দেননি। এজন্য তাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস এশীয়-আফ্রিকীয় দেশগুলোর মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের মতো নিবিড় নয়। তাদের মধ্যে ধর্মে অবিশ্বাসীদের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে বেশি। আর যারা ধর্মবিশ্বাসী, তাদের সঙ্গেও ধর্মের সম্পর্ক অনেকটা শিথিল। এশীয়-আফ্রিকীয় দেশগুলোতে মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস শক্তিশালী হওয়ায় এঅঞ্চলের সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকে ঘুষ নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ প্রদানকালে যথার্থই ধর্মকে ব্যবহারের কথা বলেছেন। এ আলোচনায় মনে রাখা দরকার যে, ঘুষ একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ব্যাধি। শারীরিক ব্যাধির মতো একে চাইলেই দ্রুত সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব নয়। কাজেই এ ব্যাধিকে নির্মূল করার চেষ্টা না করে একে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাই অধিক জরুরি।

উপহার কি ঘুষ?

ঘুষ গ্রহণ বা প্রদানের চর্চাবিষয়ক অ্যাকাডেমিক আলোচনায় উপহারকে ঘুষ হিসেবে বিবেচনা করা হবে কিনা–সে বিষয়ে অ্যাকাডেমিকদের মধ্যে জোরালো বিতর্ক আছে। মধ্যযুগে আফ্রিকার দেশগুলোতে উৎকোচ প্রদানকে অন্যায় মনে করা হতো না। কোনো নেতাকে উপঢৌকন দেওয়া আফ্রিকীয় সমাজে গ্রহণীয় সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচিত হতো। অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশেও অতীতে ঘুষকে খুব একটা ঘৃণার চোখে দেখা হতো না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মোগল আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে গেলে সঙ্গে উপহার (যেমন 'নজরানা') নিয়ে যাওয়া গ্রহণীয় রেওয়াজ ছিল। কোনো সম্মানিত নেতা বা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাকে ভালোবেসে বা শ্রদ্ধা করে উপহার দিলে তা ঘুষ হিসেবে বিবেচিত হবে কিনা–সে সম্বন্ধে দুর্নীতিবিষয়ক তাত্ত্বিকদের মধ্যে দুই রকমের মতামত রয়েছে। এক শ্রেণীর উদারপন্থী দুর্নীতি তাত্ত্বিকদের মতে, কেউ যদি কোনো নেতা বা উচ্চপদস্থ কোনো সরকারি কর্মকর্তাকে ভালোবেসে বা শ্রদ্ধা করে তাকে কোনো উপহার দেন, তাহলে তাতে কোনো দোষ নেই। একে ঘুষ হিসেবে বিবেচনা না করাই ভালো। ভালোবাসা বা শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে এমন উপহার তিনি দিতেই পারেন। কিন্তু আর এক শ্রেণীর যুক্তিবাদী দুর্নীতি গবেষক এ রকম উপহারের দিকে সন্দেহের বাঁকা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, কেউ যদি কোনো নেতা বা কর্মকর্তাকে শ্রদ্ধা করে বা ভালোবেসে কোনো উপহার দেন, আর সেটাকে ঘুষ বলা হোক বা না হোক, এ ক্ষেত্রে উপহারদাতা ও উপহারগ্রহীতার সম্পর্ক ও মনস্তত্ত্ব সতর্কতার সঙ্গে পরখ করে দেখতে

হবে। সংশ্লিষ্ট নেতা বা কর্মকর্তাকে ঐ উপহার প্রদানের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করে যদি তার কাছ থেকে সামান্যতম স্বার্থ হাসিলের কোনো লক্ষ্যও যদি সেই উপহারদাতার থাকে, তাহলে সেই উপহারপ্রদান অবশ্যই ঘুষ হিসেবে চিহ্নিত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

ঘুষ লেনদেনের ভঙ্গিমা

ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে অবৈধভাবে অর্থ প্রদানের রেওয়াজ প্রায় সকল দেশেই রয়েছে। তবে নগদ অর্থ ছাড়াও ঘুষ বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। অনেক সময় দামি উপহার, কোনো সুযোগ সুবিধাপ্রদান বা অন্য কোনো সেবা বা সুবিধাদানের মাধ্যমেও ঘুষ প্রদান করা হয়ে থাকে। একেক সমাজে ঘুষের লেনদেন হয় একেকভাবে। তবে সব সমাজেই ঘুষের লেনদেন ও চর্চায় কিছুটা গোপনীয়তা বজায় রাখার রেওয়াজ লক্ষ করা যায়। সম্প্রতি প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে অফিস-আদালতে সিসি-টিভি ক্যামেরার ব্যবহার জনপ্রিয়তা পাওয়ায় সতর্ক ঘুষ গ্রহণকারী এবং প্রদানকারীগণ অফিসকক্ষকে ঘুষগ্রহণের যোগ্য স্থান মনে না করে পরিবর্তে অফিসের বাইরে কোনো রেস্টুরেন্ট বা অন্য কোনো স্থানকে নিরাপদ মনে করছে।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘুষ লেনদেনের ভঙ্গিমায় বিভিন্ন রকম পরিবর্তন এসেছে। এক সময় ঘুষ গ্রহণকারীগণ ঘুষের টাকা বাম হাত দিয়ে গ্রহণ করতেন। অনেকে আবার ঐ টাকা স্পর্শ না করে টেবিলের ড্রয়ার খুলে প্রদানকারীকে সেখানে ঘুষের টাকা রেখে দিতে বলত। এ কাজ তারা সারত খুবই গোপনীয়তার সঙ্গে। কিন্তু সম্প্রতি ঘুষের চর্চা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, ঘুষগ্রহণকারীগণ এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর অতটা গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন মনে করছে না। উল্টো প্রকাশ্য দিবালোকে তারা লোকজনের সামনে ঘুষের অর্থ গ্রহণে দ্বিধা করছে না। লক্ষণীয়, যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘুষগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ এককভাবে দুর্নীতি করার পরিবর্তে দুর্নীতির চক্র তৈরি করে একসঙ্গে ভাগাভাগি করে ঘুষ খাওয়াকে কিছুটা নিরাপদ মনে করে, সেহেতু অফিসের অন্য সহকর্মীদের সামনে ঘুষসংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আলাপ-আলেচনা বা ঘুষের অর্থ গ্রহণে ঘুষগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ কোনো সংকোচ বোধ করে না। অনেক ক্ষেত্রে সহকর্মীদের সামনেই তারা সেবা গ্রহণকারীদের সঙ্গে ঘুষ লেনদেনের সময় ও ঘুষের অঙ্কসম্পর্কিত আলাপ সেরে নেয়। তবে বহিরাগত বা অপরিচিত লোকজন থাকলে এব্যাপারে ঘুষগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের আচরণ কিছুটা ভিন্ন রকম হয়।

ঘুষ লেনদেনের ভঙ্গিমা ও চর্চা অনেকটা সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম চর্চার মতো। প্রায়োগিক ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা না থাকলে ঘুষ লেনদেনের চর্চা, ভঙ্গিমা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

অনুধাবন করা কঠিন। এই লেনদেনের বোঝাপড়া সম্পন্ন করতে ঘুষ গ্রহণকারী ও প্রদানকারী– উভয়কেই যথেষ্ট ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হয়। তাড়াহুড়ো না করে এ ক্ষেত্রে উভয়পক্ষকে নিজ নিজ লক্ষ্যের দিকে ধীরে-সুস্থে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হয়। যেমন, রেজিস্ট্রি অফিসে বা থানায় কেউ কোনো কাজ করার জন্য গিয়ে কখনোই সাধারণভাবে বলেন না, আমার কাজটা করে দিন; বরং বলেন, আমার এ কাজ করে দিন, আমি আপনাদেরকে এত টাকা ঘুষ দেব। ঘুষ প্রদানের জন্য এ রকম সরাসরি বক্তব্য দিলে কোনো কাজ আদায় করা সম্ভব হয় না। কারণ ঘুষ আদান-প্রদানের কাজটি অন্যায় হলেও এ কাজের একটা ভদ্র ও শালীনতাগত দিক আছে। এ ক্ষেত্রে ঘুষ প্রদানকারীকে সংশ্লিষ্ট অফিসের সংস্কৃতি, নিয়মাচার, আদব-কায়দা ও বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য ঘুষের চলমান বাজারদর সম্বন্ধে জেনে নিয়ে অত্যন্ত ভদ্রভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ইঙ্গিত দিয়ে কথা বলতে হয়। এ ইঙ্গিত ঘুষ গ্রহণকারীর পক্ষ থেকেও অত্যন্ত শালীনভাবে দেওয়া হতে পারে। পরে উভয়পক্ষের দেওয়া ইঙ্গিতে সাদৃশ্য থাকলে আর কাজ করতে অসুবিধা হয় না। তখন সেবা গ্রহণকারীর ফাইলটি এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে দ্রুত গতিতে চলতে থাকে। কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়ায় অসুবিধা হলে সেবাগ্রহণকারীর ফাইল অন্য অনেক ফাইলের নীচে চাপা পড়ে যায়। অসমঝোতার ঐ ফাইল খুঁজে পেতে অনেক সময় কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে এবং তার পরেও হতে পারে নানা রকম ঝুট-ঝামেলা এবং বিলম্ব। কাজেই যারা অফিস-আদালতে সবসময় কাজকর্ম করেন, তারা সংশ্লিষ্ট অফিস-আদালতের নিয়মাচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তারা সেভাবেই পেশাদার শিল্পীর মতো সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক নির্মাণ করে তাদের কাজ এগিয়ে নিতে পারেন। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণও এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও বিশেষ পারদর্শী। তারাও পেশাদারি আচরণের মাধ্যমে তাদের ক্লায়েন্ট বা মক্কেলদেরকে লেনদেনের সম্পর্কে জড়িত হতে সহায়তা প্রদান করেন।

ঘুষের পরিভাষা

সাধারণ মানুষ ঘুষকে ঘুষ বললেও ঘুষ প্রদানকারী বা গ্রহণকারীগণ কিন্তু একে ঘুষ বলতে চান না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘুষচর্চায় জড়িতগণ ঘুষকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন। একারণে দেশে-দেশে ঘুষের বিভিন্ন রকম পরিভাষা গড়ে উঠেছে। ঘুষের পরিভাষার যুগ বা সময়ভিত্তিক ভিন্নতাও লক্ষণীয়। যেমন, এ উপমহাদেশে মোগল আমলে রাজকর্মচারীদেরকে খুশি করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত ঘুষকে 'নজরানা' বা 'সেলামি' নামে অভিহিত করা হতো। কিন্তু এখন সরকারি কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত ঘুষকে 'নজরানা' বা 'সেলামি' না বলে অনেকক্ষেত্রেই 'পারসেন্টেজ' বা 'সম্মানী' বলা হচ্ছে। বেশ কিছু এশীয় ও মধ্যপ্রাচ্যীয় দেশে ঘুষকে 'বকশিশ' বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কর্মকর্তা সেবাগ্রহীতার কাজ করে দিলে সেবাগ্রহীতা খুশি হয়ে কর্মকর্তাকে কিছু

দিচ্ছেন, যা বকশিশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পাকিস্তানসহ কিছু এশীয় দেশে আবার ঘুষকে 'চায়ে-পানি' বলা হয়। অর্থাৎ সেবাগ্রহীতাকে নির্বিঘ্নভাবে দ্রুত সেবা দিলে তিনি সেবাপ্রদানকারী কর্মকর্তাকে চা-পানি খেতে কিছু দিচ্ছেন। ভারতের কিছু অংশে 'স্পিড মানি' এবং অন্য কিছু অংশে 'খিলানা পারা' হিসাবে ঘুষের পরিচিতি রয়েছে। অর্থাৎ সেবাগ্রহীতা কিছু দিলে তার কাজের 'স্পিড' বা গতি বাড়ছে, অথবা সেবাপ্রদানকারী কর্মকর্তাদেরকে খাওয়ার নামে কিছু দিলে সহজে কাজ হয়ে যাচ্ছে। ভারতের 'খিলানা পারা'র সঙ্গে থাইল্যান্ডের ঘুষের পরিভাষা 'কিন মানি'র সাদৃশ্য রয়েছে; যার অর্থ খাওয়ানোর জন্য প্রদত্ত অর্থ। জাপানের ঘুষের পরিভাষা 'সিটো ফুমেকিন'-এর অর্থ হলো এমন ব্যয়, যা ব্যক্ত করা যায় না (আনএক্সপ্লেইনড এক্সপেনসেস)। ল্যাটিন আমেরিকার ঘুষের পরিভাষা 'লা মোরদিদা' এবং ইতালির ঘুষের পরিভাষা 'লা বাস্টারেল্লা'-র অর্থ যথাক্রমে 'ছোট্ট কামড়' এবং 'ছোট ইনভেলাপ'। অস্ট্রেলিয়ায় 'ব্রাউন পেপার ব্যাগ' এবং পশ্চিম আফ্রিকায় 'ড্যাস' ঘুষের পরিভাষা হিসাবে পরিচিত। ফিলিপাইনের ঘুষের পরিভাষা 'লাগে' কাজের গতি-বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং ঘানার ঘুষের পরিভাষা 'রেট মানি' নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্ধারিত অবৈধ ব্যয়কে বুঝায়। চীনের ঘুষের পরিভাষা 'সৌউহুই' এবং 'ব্যাক ডোর' যথাক্রমে সরকারি পদমর্যাদা ব্যবহার করে অবৈধ উপার্জন এবং অবৈধ মুনাফার লক্ষ্যে অবৈধ প্রদানকে বুঝায়। ঘুষের পরিভাষা অনেক সময় পেশার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে গড়ে ওঠে। যেমন আমেরিকার যৌনকর্মীরা আইনের হাত থেকে অবৈধ রক্ষা পেতে যে ঘুষ প্রদান করেন, তাকে বলা হয় 'প্রটেকশন মানি'। এছাড়া ফ্রান্সে 'সোলস লা টেবল' (টেবিলের নীচ থেকে), তুরস্কে 'রুশভেত' (বকশিশ), তাইওয়ানে 'হুং বাও' (লাল খামে অর্থপ্রদান), দক্ষিণ কোরিয়ায় 'চুন চোজ' (হালকা/হাল্কা কর) এবং আরো অনেক দেশে ঘুষের বিচিত্র রকম পরিভাষা রয়েছে। নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং ঘুষ চর্চাকারীদেরকে পাকড়াও করার জন্য পরিদর্শন ও সারভিলেন্স কার্যক্রম বৃদ্ধির কারণে ঘুষ আদান-প্রদান ভঙ্গিমায় যেমন বৈচিত্র্য এসেছে তেমনি ঘুষের লেনদেনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে নতুন নতুন ঘুষের পরিভাষা।

বিশ্বব্যাপী দুর্নীতির ভয়াবহ প্রসারের সঙ্গে ঘুষের ব্যবহার ও চর্চায়ও ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যেমন বিভিন্ন দেশে নিত্য-নতুন আইন এবং নতুন নতুন সংস্থা গড়ে উঠছে, বাড়ছে সারভিলেন্স, মোবাইল ট্রাকিং, সিসি-টিভি ক্যামেরাসহ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, তেমনি এসব আইন, সংস্থা ও প্রযুক্তিকে ফাঁকি দিয়ে দুর্নীতিবাজেরা এবং ঘুষ গ্রহণ ও প্রদানকারীগণও নিত্য-নতুন কৌশলে তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে। প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং দুর্নীতি ও ঘুষ নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি আরোপের কারণে দুর্নীতি-সাহিত্যে দুর্নীতি ও ঘুষচর্চার নিত্য-নতুন ভঙ্গিমার উপস্থিতি ও সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেশে দেশে জন্ম নিচ্ছে ঘুষের নতুন নতুন পরিভাষা। দুর্নীতিসংক্রান্ত গবেষকগণও

এদিকে মনোযোগ রাখছেন এবং সময়মত তারা ঘুষের নতুন পরিভাষাগুলোর অর্থ, ইতিহাস ও পরিপ্রেক্ষিত উদ্ঘাটন করে তা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরতে সচেষ্ট রয়েছেন।

উপসংহার

সমাজ, প্রশাসন ও রাজনীতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির মতো ঘুষের উপস্থিতি ও চর্চা আদিকাল থেকে বিভিন্ন স্বরূপ, ভঙ্গিমা ও মাত্রায় বিদ্যমান আছে। সাম্প্রতিককালে মাত্রা বৃদ্ধির কারণে সুশাসনের পথে হুমকি সৃষ্টি করায় ঘুষ নিয়ন্ত্রণের ওপর বিশ্বব্যাপী গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। অনেক দেশেই ঘুষকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করলেও অন্যান্য জাতীয় সমস্যা নিয়ন্ত্রণে যতটা মনোযোগ এবং অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে, ঘুষ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তেমনটা হচ্ছে না। বিশ্বব্যাপী দেশে-দেশে ঘুষের ব্যবহার বর্তমানে মাত্রাভেদে সমাজের সকল আঙ্গিনায় ছড়িয়ে পড়েছে। এখন ঘুষ একটি আগ্রহের গবেষণার স্থান হলেও এবং এ বিষয়ে অনেক গবেষণা কাজ প্রকাশিত হলেও সমাজবিজ্ঞানীরা ঘুষের সকল এলাকায় সমান গুরুত্ব দিয়ে গবেষণা কাজ করেননি। ঘুষের লেনদেন ভঙ্গিমা ও পরিভাষার ওপর সমাজবিজ্ঞানীরা দুর্নীতি সাহিত্যে অপ্রতুল আলোকপাত করেছেন। ঘুষ সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী সমস্যা হিসেবে প্রাদুর্ভূত হওয়ায় বিভিন্ন দেশে এর অস্তিত্বের মাত্রা ও চর্চা পরিমাপ করে আন্তর্জাতিকভাবে ঘুষের সূচক (ব্রাইবারি ইনডেক্স) প্রকাশ করা হচ্ছে।

দারিদ্রের কারণেই শুধু ঘুষের চর্চা হয় না এবং বাড়ে না। অসম সামাজিক প্রতিযোগিতা ও রাতারাতি অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার বাসনা মানুষকে ঘুষচর্চায় আকৃষ্ট করে। উন্নয়নশীল দেশে ঘুষকে অন্যায় বিবেচনা না করে স্বাভাবিক জীবনাচার হিসেবে গণ্য করা হয়। দুর্নীতিবান্ধব সংস্কৃতি সামাজিক ঘুষপ্রদানের মাধ্যমে ঘুষখোরদের সামাজিক মর্যাদা ক্রয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আইন তৈরি করে বা শাস্তিপ্রদানের মাধ্যমে ঘুষ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। সামাজিকীকরণ ও শিক্ষার প্রসার এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ধর্মের সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে ঘুষের চর্চা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে। উপহারপ্রদানকে ঘুষ মানতে অনেকে রাজি না হলেও প্রদত্ত উপহারের পেছনে আনুকূল্য লাভের বাসনা থাকলে তা ঘুষ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয়। সূক্ষ্ম শিল্পচর্চার মতো ঘুষের লেনদেন কাজে যুগপৎ শালীনতা ও গোপনীয়তা রক্ষার রেওয়াজ রয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারের ফলে ঘুষের লেনদেনে সতর্কতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘুষ গ্রহণ ও প্রদানকারীগণ ঘুষকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করায় বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতিতে ঘুষের বিভিন্ন রকম পরিভাষা গড়ে উঠেছে। সমাজ গবেষকগণ তাদের গবেষণা কাজের মধ্য দিয়ে এসব পরিভাষার জন্মবৃত্তান্ত ও পরিচিতি নাগরিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছে তুলে ধরছেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. এ ধরনের কয়েকটি কাজের জন্য দেখা যেতে পারে, Arnold J. Heidenheimer (ed.), *Political Corruption: Readings in Comparative Analysis* (New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970; ames C. Scott, *Comparative Political Corruption* (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Clifs, 1972); Arnold A. Rogow & Harold D. Lasswell, *Power, Corruption and Rectitude* (Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall, 1963); George Benson, *Political Corruption in America* (Lexington: Lexington Books, 1978); Ledivina V. Carino (ed.), *Bureaucratic Corruption in Asia: Causes, Consequences, and Controls* (Quezon City: The Philippines: JMC Press, 1986); Robert Klitgaard, *Controlling Corruption* (Berkeley: University of California Press, 1988); Robert Williams, *Political Corruption in Africa* (Hampshire, Gower, 1987);Surendranath Dwivedy & G. S. Bhargava, *Political Corruption in India* (New Delhi: Popular Book Services, 1967); Susan Rose-Ackerman, *Corruption: A Study in Political Economy* (New York: Academic Press, 1978); Muhammad Yeahia Akhter, *Electoral Corruption in Bangladesh* (Aldershot: Ashgate Publishing Limited, 2001); 'Styles of Administrative Corruption: The Case of a Bangladeshi Organization', *Politics, Administration & Change*, vol. 12, no. 1, 1987, pp. 61-76; মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *দুর্নীতির স্বরূপ অন্বেষণ: বাংলাদেশ* (ঢাকা: নিবেদন পাবলিকেশন্স, ১৯৯১); 'দুর্নীতি ও উন্নয়ন: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ', প্রশাসন সমীক্ষা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৯৬, পৃষ্ঠা: ৪৯-৬২; 'প্রশাসনিক দুর্নীতি দমন', প্রশাসন সমীক্ষা, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৯৭, পৃষ্ঠা: ৫৬-৮৬।

২. ঘুষের ওপর এ রকম কিছু গবেষণা কাজের নমুনা হিসেবে দেখা যায়, R. K. Soonavala, *The Law Relating to Bribery and Corruption* (Bombay: N. M. Tripathi Pvt. Ltd., 1964); Neil Jacoby, Peter Nehemkis and Richard Eells, *Bribery and Extortion in World Business* (New York: Macmillan, 1977); John T. Noonan, Jr., *Bribes* (New York: Macmillian, 1984); Gautam Bose, 'Bureaucratic delays and bribe taking', *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol. 54, issue: 3, 2004, pp. 313-320;

Richard L. Cussin, *Bribery Abroad: Lessons from the Foreign Corrupt Practices Act* (Lulu com : 2008); Richard L. Cussin, *Bribery Everywhere : Chronicles from the Foreign Corrupt Practices Act* (Lulu com : 2009); Martin T. Biegelman & Daniel R. Bieqelman, *Foreign Corrupt Practices Act Compliance Guidebook: Protecting Your Organization from Bribery and Corruption* (Wiley: 2010); Brain P. Loughman & Richard A. Siberty, *Bribery and Corruption: Navigating the Global Risks* (Wiley: 2011); Julie Marie Bunck & Michael Ross Fowler, *Bribes, Bullets, and Intimidation: Drug Trafficking and the Law in Central America* (Pensylvania: Pensylvania State University Press, 2012); Michael J. Comer & Timothy E. Stephens, *Bribery and Corruption* (Aldershot: Ashgate, 2013); Taras Fedirko, "I'd Rather Pay" : Bribery and Informal Practices in Ukrinian Bureaucracy,' *Student Anthropologist*, vol. 3, issu: 2, 2013, pp. 61-84.

৩. এই জাতীয় সংসদ সদস্যের নাম মেজর (অব.) বজলুল হুদা। তিনি ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান-বৈষম্য আলোচনাপ্রসঙ্গে এ তথ্য উপস্থাপন করেন। উক্ত আলোচনায় আরও কয়েকজন সংসদ সদস্য জানান, মন্ত্রীরা বিশেষ বিশেষ এলাকার জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করছেন এবং তার জন্য পারসেন্টেজ নিচ্ছেন। (তথ্য সংগৃহীত, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, *দুর্নীতির স্বরূপ অন্বেষণ: বাংলাদেশ* ঢাকা: নিবেদন পাবলিকেশন্স, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ৫৭; ৮৬)।

৪. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখা যেতে পারে, Mahfuzul H. Chowdhury, 'Violence, Politics and the State in Bangladesh', *Conflict, Security & Development*, Vol. 3, No. 2, 2003, pp. 265-276.

৫. তথ্য সংগৃহীত, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'বাংলাদেশের নির্বাচনকালীন রাজনীতি: একটি গ্রামভিত্তিক নিরীক্ষণ', *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ* (সমাজ বিজ্ঞান), খণ্ড ৮, সংখ্যা ১, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২০৯-২৩৪।

৬. প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, 'দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে একটি প্রস্তাব', *টিআইবি নিউজলেটার*, ৪ বর্ষ, ১ সংখ্যা, মার্চ ২০০০।